هذا هو الإسلام ـ بنغالي

এটাই
হল ইসলাম

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

200

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦ ـ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

جمعية الدعوة بالزلفي

এটাই হল ইসলাম

هذا هو الإسلام – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

هذا هو الإسلام

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الخامسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي

هذا هو الإسلام / شعبة توعية الجاليات بالزلفي
٧٣ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٧-٤٢- ٣ ٨٠١-٦٠٣ -٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)

١-الإسلام- مبادئ عامة أ. العنوان

ديوي ٢١١ ١٤٣٤/١٠٦٥٩

رقم الإيداع : ١٤٣٤/١٠٦٥٩
ردمك : ٧-٤٢- ٣ ٨٠١-٦٠٣ -٩٧٨

هذا هو الإسلام

এটাই হল ইসলাম

ভূমিকা

মানুষ যখন এই পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যেখানে সে বসবাস করছে, যখন এই সুন্দর ও বিশাল-বিস্তৃত বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যখন সে চিন্তা করে আকাশ ও অসংখ্য তারকারাজিকে নিয়ে যা সুশৃঙ্খল-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যখন সে ভাবে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা, হাওয়া ও পানি, জলস্থল ও দিবারাত্রিকে নিয়ে, তখন সে নিজেকে অবশ্যই এই প্রশ্ন করে যে, এ সবের স্রষ্টা কে? কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, যে বৃষ্টি ছাড়া জীবন চলে না? কে এই বৃষ্টির দ্বারা উদ্ভিদ, গাছ-পালা, ফুল ও ফল উৎপন্ন ক'রে মানুষ ও জীবজন্তুকে তা পান করায় এবং যমীনকে তা সংরক্ষণের যোগ্য বানায়? জিনিসের প্রয়োজন পরিমিত আকর্ষণ শক্তি যমীনের মধ্যে কে সৃষ্টি করেছে যে, এত বেশীও হয় না যে, চলফেরার অসুবিধা হবে এবং এতটা কমেও যায় না যে, তার থেকে জিনিস-পত্র উড়ে যাবে? কে মানুষকে এত সুন্দর আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

মানুষ যদি কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে, তাহলে সে বিস্মিত হবে স্রষ্টার চমৎকার আবিষ্কার ও তাঁর নিখুঁত শিল্পায়ন দেখে। ভাবতো তুমি তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে নিয়ে যা নিপুনভাবে কাজ করতে আছে। তুমি তার কর্মাবলী সম্বন্ধে কমই জান। তাতে (কার্যকারিতার) নৈপণ্য সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লক্ষ্য কর, এই হাওয়ার প্রতি যার মাধ্যমে তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছ। যদি নিমেষের জন্য তা দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। কে সৃষ্টি করেন এই হাওয়াকে?

যে পানি তুমি পান কর, যে খাদ্য তুমি খাও, যে যমীনের উপর তুমি চলা-ফেরা কর, আকাশ ও তাতে বিদ্যমান যা কিছু রয়েছে, যে সূর্য তোমাকে আলো দেয় এবং চন্দ্র ও তারকারাজি সহ যা কিছু তোমার দুই চোখ দেখে, এ সবের স্রষ্টা কে? অবশ্যই তিনি হলেন আল্লাহ। এই সার্বভৌমত্ব তাঁরই সৃষ্টি। এতে কেবল তাঁরই কর্তৃত্ব চলে এবং তিনিই এ সব পরিচালিত করেন।

তিনি তোমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। তোমার আহারদাতা এবং তিনিই তোমার জীবন ও মরণের মালিক। তুমি ছিলে না, তিনিই তোমাকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। এই পৃথিবী ও তাতে বিদ্যমান কোনো কিছুই ছিল না, তিনিই এসব অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। এত কিছুর পর কোনো বুদ্ধিমান ও বিবেকবান কি ভাবতে পারে যে, এ বিশ্বচরাচর অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? এখানে মানুষ (প্রাকৃতিকভাবে) জন্ম গ্রহণ ক'রে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মরে যাবে। আর এইভাবেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে? প্রকৃত ব্যাপার কি? আমরা কেন সৃষ্টি হয়েছি বা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কেবল তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর ইবাদতের তরীকা-পদ্ধতি জানানোর জন্য আমাদের নিকট বহু রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যে তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর নির্দেশাবলী পালন করবে এবং তাঁর নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকবে, সে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। আর যে তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হবে এবং তাঁর নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে, সে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির শিকার হবে। মহান আল্লাহ এই দুনিয়াকে

বানিয়েছেন কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষার স্থান। অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল মানুষের পুনরুত্থান ঘটাবেন প্রতিদান ও হিসাবের জন্য। আল্লাহ সেখানে রেখেছেন জান্নাত। তাতে আছে এমন জিনিস যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তা উদয়ও হয়নি। এটা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তাঁর সেই মু'মিন বান্দাদের জন্য, যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর নির্দেশ পালন করে। তিনি জাহান্নামও বানিয়েছেন। তাতে আছে এমন বিভিন্ন প্রকারের আযাব, যার ভয়াবহতা কল্পনাতীত। এ আযাব আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তার জন্য, যে তাঁর সাথে কুফরী করে, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে এবং ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের অনুসরণ করে।

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম হল আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম। ইসলাম কেবল এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ-ﷺ-এর আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান জানায়। মহান আল্লাহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম কারো থেকে গ্রহণ করবেন না। আর এ ধর্ম কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং ইসলাম হল সমগ্র মানব জাতির ধর্ম। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কিছু নির্দেশাবলী পালন করাতে বলেছেন এবং কিছু বিষেধাবলী থেকে বিরক থাকতে বলেছেন। যে তাঁর আনুগত্য করবে, সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। আর যে তাঁর অবাধ্যতা করবে, সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি-কুলের জন্য তখন থেকেই মনোনীত করেছেন, যখন থেকে এই যমীনে (মানব) জীবনের সূচনা হয়েছে। ইসলাম হল সেই ধর্ম, যার প্রতি আহ্বান করেছেন আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত রাসূলগণ।

সৃষ্টির সূচনা

যখন মহান আল্লাহ আদি পিতা আদম-عليه السلام-কে সৃষ্টি করেন, তখন থেকেই সৃষ্টির সূচনা হয়। আল্লাহ তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি ক'রে তাঁর মধ্যে আত্মা দান করেন। কিছু জিনিসের নাম তাঁকে শিখিয়ে দেন। তাঁর মর্যাদা-সম্মান বর্ধিত করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন তাঁকে সাজদা করার। সমস্ত ফেরেশতাগণ তাঁকে সাজদা করেন। ইবলীস আদমের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করে এবং অহঙ্কারের বশীভূত হয়ে তাঁকে সাজদা করা থেকে বিরত থাকে। তখন আল্লাহ তাকে আকাশের রাজত্ব হতে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় যমীনে পাঠিয়ে দেন। সেই সাথে দুর্ভাগ্য, অভিশাপ এবং জাহান্নাম তার জন্য নির্ধারিত করে দেন। ইবলীস তখন তার প্রতি-পালকের নিকট কামনা করল যে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হোক। আল্লাহ তাকে অবকাশ দিলেন। ইবলীস কসম খেয়ে বলল যে, সে সমস্ত আদম-সন্তানদের ভ্রষ্ট ক'রে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে দিবে।

অতঃপর আল্লাহ আদম-عليه السلام-থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। যাতে তিনি তাঁর নিকট শান্তি পান এবং তার সাথে নিঃসঙ্গতা দূর করেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে সেই জান্নাতে থাকতে নির্দেশ দেন, যেখানে আছে কল্পনাতীত নিয়ামত। তাঁদের সাথে ইবলীসের শত্রুতার কথাও তাঁদেরকে জানিয়ে দেন এবং তাঁদের পরীক্ষা স্বরূপ জান্নাতের গাছের মধ্যে কোনো এক গাছ থেকে তাঁদেরকে খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে এই গাছ থেকে খাওয়াকেই তাঁদের জন্য সুশোভিত করে তুলল। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ ক'রে বলল যে, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। তোমরা জান্নাতে স্থায়ী হতে চাইলে এই গাছ থেকে খাও।'

তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিতেই থাকল এবং শেষপর্যায়ে সে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করতে সফল হল। তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিষেধ অমান্য ক'রে (নিষিদ্ধ) গাছ হতে খেয়ে ফেললেন। তাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং তাঁদের প্রতিপালকের নিকট তাওবা করলেন। আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করলেন। তবে তিনি তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের ক'রে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন।

ফলে আদম-عليه السلام-ও তাঁর স্ত্রী যমীনে বসবাস শুরু করলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করলেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততি বাড়তে বাড়তে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

ইবলীস ও তার চেলারা অব্যাহতভাবে আদম-সন্তানদের বিভ্রান্ত করার, তাদেরকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখার, অন্যায়কে তাদের নিকট শোভনীয় করে তোলার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে তাদেরকে দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে চায় আখেরাতে তারা যেন জাহান্নামে প্রবেশ করে। তবে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অমনোযোগী নন। তিনি তাদের যত্ন নিয়েছেন এবং তাদের জন্য বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের নিকট সত্যকে তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যাতে আছে তাদের মুক্তি।

আদম-عليه السلام-এর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর প্রায় দশ শতাব্দী পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর শির্ক ও গায়রুল্লাহর ইবাদতের সূচনা হয়। মানুষ মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। তাই আল্লাহ তাঁর প্রথম রাসূল নূহ-عليه السلام-কে প্রেরণ করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বলেন। এইভাবে একের পর এক নবী ও রাসূলগণের আগমনী

ধারা চলতে থাকে। সকলেই ইসলাম তথা কেবল আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানান এবং গায়রুল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করতে বলেন। অতঃপর ইব্রাহীম-عليه السلام-প্রেরিত হোন। তিনিও তাঁর জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ ক'রে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর (ইব্রাহীম-عليه السلام-এর) পর তাঁর ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাক্ব নবী হোন। অতঃপর ইসহাক্ব-عليه السلام-এর বংশ থেকে বেশ কয়েকজন নবী হোন। ইসহাক্ব-عليه السلام-এর বংশ থেকে যাঁরা নবী হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, ইয়াক্বূব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলাইমান এবং ঈসা (আল্লাহ এঁদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন!)। ঈসা-عليه السلام-এর পর ইসহাক্ব-عليه السلام-এর বংশ থেকে আর কোনো নবী আসেননি।

এরপর নবূওয়াত চলে যায় ইসামঈল-عليه السلام-এর বংশে। এই বংশ থেকে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ-ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনিই হলেন শেষ নবী। তাঁর নবূওয়াতই শেষ নবূওয়াত। যে কুরআন তাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়, সেই কুরআনই হল আল্লাহর পক্ষ হতে মানবতার জন্য শেষ পায়গাম। আর এই জন্যই তাঁর নবূওয়াত পরিপূর্ণ, সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত, তা মানুষ, জ্বিন, আরব, অনারব সকলের জন্য এবং তা সর্বযুগ, সর্বস্থান এবং সকল জাতি ও সর্বাবস্থার জন্য উপযুক্ত। এমন কোনো কল্যাণ নেই, যে ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয়নি এবং এমন কোনো অকল্যাণ নেই, যে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়নি। মুহাম্মাদ-ﷺ-যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন, সে ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা হবে না।

নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ-عليه السلام-কে শেষ নবী করে প্রেরণ করেন। তাঁর নবূওয়াত দিয়েই নবূওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ করেন। তাঁকে আল্লাহ

প্রেরণ করেন, যাতে তিনি মানুষকে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার কথা শিক্ষা দেন এবং এর বিপরীত মূর্তিপূজা ইত্যাদি সহ যত কিছুর ইবাদত তারা করত, তার সবকিছুকে যেন তারা বর্জন করে। তিনি-ﷺ- যখন মক্কায় নবী হিসাবে মনোনীত হোন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০বছর। নবী হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর জাতির মধ্যে বড় উন্নত গুণের মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বরং তিনি পুরো মানবতার মধ্যে সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, বিশ্বস্ততা এবং উচ্চ নৈতিকতার গুণে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর জাতি তাঁর উপাধি দিয়ে ছিল 'আল-আমীন' তথা বিশ্বস্ত। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন না। আল্লাহ তাঁর উপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং সমগ্র মানবতাকে চ্যালেনজ করেন যে, তারা অনুরূপ গ্রন্থ আনুক তো।

তাঁর বংশ পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্ত্বালিব ইবনে হাশিম। আর হাশিম গোত্র হল ইসমাঈল-عليه السلام-এর বংশধর। তাঁর মায়ের নাম ছিল, আমিনা বিনতে অহাব ইবনে আব্দু মানাফ ইবনে যাহরা। আর যাহরা হল নবী করীম-عليه السلام-এর দাদার ভাই। আমিনার সাথে নবী করীম-ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহর বিবাহ হয় এবং তাঁর সাথে তিন দিন অবস্থান করেন। এরই মধ্যে আমিনা নবী করীম-ﷺ-কে গর্ভে ধারণ করেন। অন্যান্য নারীরা যেভাবে গর্ভ ধারণের কষ্ট বোধ করেন, এ রকম কোনো কষ্ট তাঁর হয়নি। অতঃপর তাঁর মা তাঁকে প্রসব করেন। সুন্দর আকার-আকৃতি এবং সুস্থ-সবল অবস্থায় তিনি জন্ম নেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল, ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর বাবা মারা যান। তাই তাঁর দাদা আব্দুল

মুত্ত্বালিব তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর মা তাঁকে কেবল তিন দিন দুধ পান করান। অতঃপর তাঁর দাদা হালিমা সা'দিয়াহ নামক এক বেদুঈন মহিলার সাথে তাঁর দুধ পানের চুক্তি করেন। আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে দুধ পান করানোর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ থাকত।

হালিমা সা'দিয়াহ এই দুধের শিশুর বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করেন। আর তা হল এই যে, তিনি তাঁর স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লা-ﷺ-কে কোলে নেয়ার পর গাধী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল এবং অন্যান্য সব সওয়ারীকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোনো দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। রাসূলে করীম-ﷺ-তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগল। বনী সাদ গোত্র অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সর্ম্পকে তিনি বলেন যে, এ শিশু (মুহাম্মদ-ﷺ-) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগল ফল-মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশুরা দিতে লাগল বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সর্বত্রে দেখাদিল সুখ ও সমৃদ্ধি।

মুহাম্মাদ-ﷺ-হালিমার পরিচর্যায় দু'বছর পালিত হোন। তিনি তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন। এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন। দু'বছর শেষ হবার পর হালিমা তাঁকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন।

কিন্তু তিনি যেহেতু রাসূল-ﷺ-এর কারণে বহু এমন বরকত অবলোকন করেছেন, যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তাই আমিনার কাছে রাসূল-ﷺ-কে দ্বিতীয়বার দেয়ার জন্য আবেদন করেন। আমেনা তাতে সম্মত হোন। হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসেন।

দু'বছর পর হালিমা তাঁকে নিয়ে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে আসেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চার বছর। তিনি তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানেই থাকতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা মারা যান। তারপর দু'বছর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর দেখাশুনা করেন। অতঃপর দাদা মারা গেলে তাঁর চাচা আবূ তালিব নিজের সন্তানদের মত সযত্নে তাঁর লালন-পালন করেন। তবে তিনি যেহেতু গরীব ছিলেন, তাই মুহাম্মাদ-ﷺ-ভোগ-বিলাসের জীবন পাননি। বনী সাদ গোত্র অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকাকালীন তিনি তাঁর দুধ ভাইদের সাথে ছাগল চরানোর কাজে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি মক্কাবাসীর ছাগল চরানোর কাজ করতে লাগলেন। আর এ পারিশ্রমিক তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের হাতে তুলে দিতেন। ১২বছর বয়সে তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেন। অতঃপর খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ-এর মাল নিয়েও তিনি ব্যবসা জন্য সফর করেন। খাদীজা মক্কার একজন বিত্তশালিণী মহিলা ছিলেন। অন্য ব্যবসায়ীদের যে পরিমাণ দিতেন, তার থেকে বেশী পরিমাণ তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-কে দিলেন। কারণ, তিনি-ﷺ-দ্বিগুণ মুনাফা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে তিনি সিরিয়া গমন করেন। খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী বিধবা মহিলা।

সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস 'মাইসারাহ।' রাসূলে করীম-ﷺ-এর বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস 'মাইসারাহ'-এর কাছে এত লাভ হওয়ার কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেই বেচাকেনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কারো প্রতি কোনো যুলুম ছাড়াই লাভ হয় প্রচুর। খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-এর প্রতি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হোন। তাই মুহাম্মাদ-ﷺ-এর মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান। আর তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তাঁর নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হয়। তাঁরা একে অপরকে পেয়ে সুখী হোন। তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। খাদীজা গর্ভধারণ ও প্রসব করেন। খাদীজার গর্ভে জন্ম লাভ করেন কন্যাদের মধ্যে, যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম ও ফাত্বিমা। আর ছেলেদের মধ্যে কাসিম ও আব্দুল্লাহ, যারা শৈশবেই মারা যান।

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার সন্নিকটে পূর্বদিকে (নূর নামক) এক পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন ও কয়েক রাত আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২১তারিখের রাতে গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। জিবরীল-

ﷺ-বলেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরীল-ﷺ- দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরীল-ﷺ-বলেন,

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

"পাঠ কর, তোমার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করস তোমার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" (আলাক১-৫) অতঃপর জিবরীল-ﷺ-চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হল। ভয় ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সবকিছু খাদীজাকে খুলে বললেন। এর পর তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসর্ম্পক বজায় রাখেন, অভাবীদের সাহায্য করেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তি-দেরকে দান করেন। অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন'।

কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। ইবাদত শেষে গুহা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অবতরণ করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন জিবরীল-

ﷺ-আকাশ ও যীমনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রতি অহী করেন।

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

[المدثر ٥-١:]

"হে চাদরাবৃত! উঠ, সতর্ক কর, তোমার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা দূর কর।" (সূরা মুদ্দাসসির ১-৫) পরবর্তী সময়ে অহী অব্যাহত থাকে।

আল্লাহ মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নির্দেশ দেন মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি এবং যে ইসলামকে তিনি মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন তার প্রতি আহ্বান জানাতে। নবী করীম-ﷺ-কৌশল ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর আহ্বানে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাড়া দেন খাদীজা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-পুরুষদের মধ্যে তাঁর বন্ধু আবূ বাকার, আর শিশুদের মধ্যে তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবূ তালিব এইভাবে শুরু হয়ে গেল মানুষের ইসলাম গ্রহণ করার পালা। ফলে তাদের উপর মুশরিকদের অত্যাচার কঠোর হয়ে উঠল। তিনি -ﷺ-মক্কায় অব্যাহতবে ১৩ বছর পর্যন্ত মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তাঁর ও তাঁর সাথীদের উপর মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচারের পালা বেড়ে গেল। তাই তিনি ও তাঁর সাথীগণ হিজরত ক'রে মদীনায় চলে গেলেন। তিনি দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখলেন। ফলে কয়েক বছর পর তিনি যখন মক্কায় ফিরে এলেন, তখন সমস্ত মক্কাবাসী ইসলামে প্রবেশ করল।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দিলেন। আর তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩বছর। নবী হওয়ার পূর্বের জীবন ৪০ বছর। আর নবূওয়াতী জীবন

২৩ বছর। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসমান থেকে বার্তা আসার পালা সমাপ্ত করলেন এবং সকল মানুষের উপর এই নবীর আনুগত্য করাকে অপরিহার্য করে দিলেন। যে তাঁর আনুগত্য করবে, সে দুনিয়াতে সৌভাগ্য লাভ ধন্য হবে এবং আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর অবাধ্যতা করবে, তাকে দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশার শিকার হতে হবে এবং আখেরাতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবাগণ তাঁর তরীকার অনুসরণ করেন, তাঁর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন এবং আল্লাহর যমীনে ইসলামের প্রচার করেন।

নবী করীম-ﷺ-এর চরিত্র

মুহাম্মাদ-ﷺ-মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্য নবী হওয়ার পূর্বেও ছিল এবং নবী হওয়ার পর আরো উন্নত হয়েছিল। তাঁকে তাঁর মহান প্রতিপালক

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

“অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী” বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিতেন এবং তার প্রতি মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি-ﷺ-তাঁর সাহাবীদের মাঝে নৈতিকতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে কথা, নির্দেশ ও নসীহতের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের বীজ বপন করার পূর্বে স্বীয় ব্যাবহারের মাধ্যমে মহান চরিত্রের বীজ বপন করতেন। আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দশ বছর নবী করীম-ﷺ-এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! কোনোদিন আমাকে (বিরক্ত হয়ে) ‘উঃ’ পর্যন্ত বলেননি। আর কোনো কিছুর জন্য এ কথাও বলেননি যে, এটা কেন করলে? এ রকম কেন করলে না?

আনাস-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর গায়ে মোটা পেড়ে একখানি চাদর ছিল। পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী-ﷺ-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টান দেওয়ার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর সে বলল, ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর। তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

নবী করীম-ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তিনি-ﷺ-বাড়িতে কি করেন? উত্তরে মা-আয়েশা বললেন, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করেন। যখন নামাযের সময় হয়ে যায়, তখন তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যান।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস-رضي الله عنه-বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-অপেক্ষা মৃদ হাসতে অন্য কাউকে দেখেনি।

জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-এর নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি না করতেন না। এটাই ছিল তাঁর চরিত্র যে, তিনি বড় দানশীল ছিলেন। কোনো কিছুর ব্যাপারে কৃপণতা করতেন না। তিনি নির্ভীক সাহসী ছিলেন। ন্যায়সঙ্গত কোনো ব্যাপারে কখনোও পশ্চাৎপদ হতেন না। সুবিচারক ছিলেন। কখনোও কোনো মীমাংসায় অবিচার করতেন না। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। তাঁদের সংস্রবে থাকতেন। তাঁদের ছোট শিশুদের সাথে রসিকতা করতেন। তাদেরকে কোলে নিতেন। দাওয়াত কবুল করতেন। অসুস্থদের দেখতে

যেতেন এবং মানুষের ওজর-আপত্তি কবুল করতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে উত্তম নামে ডাকতেন এবং কারো কথা কাটতেন না। আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্জাশীর পক্ষ হতে প্রতিনিধি দল এলে নবী করীম-ﷺ-তাদের খেদমতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আপনার হয়ে আমরাই যথেষ্ট। তিনি বললেন, তারা আমার সাহাবীদের বড়ই সম্মান করেছে, তাই আমি নিজে তার প্রতিদান দেওয়া পছন্দ করছি। আর তিনি বলতেন, আমি একজন দাস। তাই আমি ঐভাবেই খাই, যেভাবে একজন দাসের খাওয়া উচিত। আর ঐভাবে বসি, যেভাবে একজন দাসের বসা উচিত। তিনি গাধায় আরোহণ করতেন। অভাবগ্রস্তদের দেখতে যেতেন এবং ফকীর-মিসকীনদের সাথে উঠা-বসা করতেন।

স্কটলেন্ডের নভেল পুরস্কার লাভকারী টমাস কারলাইল (Thomas Carlye) তার কিতাব 'বীর' এ বলেছেন, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ হল এই ধরনের কথার প্রতি কান দেওয়া যে, ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ একজন প্রতারক ও মিথ্যুক।

ব্রিটেনের বার্নার্ডশো (Bernard Shaw) তার রচিত বই 'মুহাম্মাদ' এ লিখেছেন, (যে বইটা ব্রিটিশ সরকার জ্বালিয়ে দিয়েছে) বিশ্বের অতীব প্রয়োজন মুহাম্মাদের মত একজন চিন্তাবিদের। এই নবী তাঁর দ্বীনকে বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানে রেখেছেন। কারণ, ইসলামই এমন বৃহত্তর ধর্ম, যা সকল সভ্যতার চিরকালীন পরিবর্তন এনেছে। আমি আমার জাতির অনেককে দেখেছি যে, তারা জ্ঞানের আলোকে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে। আর এই দ্বীন ইউরোপ মহাদেশে বড় প্রশস্ততা লাভ করবে। তিনি বলেন, মধ্য যুগের ধর্মের পণ্ডিতরা মূর্খতা অথবা পক্ষপাতিত্বের

বশবর্তী হয়ে মুহাম্মাদের দ্বীনকে কু-শ্রীরূপে চিত্রিত করেছে। তারা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের শত্রু মনে করেছে। কিন্তু আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে পড়ে বড় বিস্ময়কর ও অলৌকিক জিনিস পেয়েছি এবং এই পরিণামে পৌঁছেছি যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের শত্রু ছিলেন না, বরং তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা আখ্যা দেওয়া আবশ্যক। আর আমার মতে তিনি যদি আজ বিশ্বের নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে আমাদের সমূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এবং সেই শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত, যার প্রতি মানুষ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

তাঁর কতিপয় মু'জিযা

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জিযা এই কুরআন। এ কুরআন আরবি সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে। আল্লাহ সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুরূপ ১টি সূরা রচনা করে আনো। মুশরিকরা কুরআনের মু'জিযা স্বীকার করেছে। আজও এই চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। মক্কার কাফেররা তাঁকে চ্যালেঞ্জ দিল যে, আপনি (যদি সত্যিকারের নবী হোন তাহলে) চাঁদকে দু'টুকরো করে দেখান তো দেখি। তখন তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছিল। অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। এক ইয়াহুদী নারী রাসূলকে বিষযোগে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক বিষ মাখা রানের গোশত খেতে দিলে সে রান রাসূলের সাথে কথা বলেছে। একবার এক বেদুঈন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বললে। তিনি একটি গাছকে

নির্দেশ দিলে তাঁর কাছে চলে আসে। আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে যায়। এক দুগ্ধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে। তিনি তা দোহন ক'রে নিজেও পান করেন এবং আবূ বাকারকেও পান করতে দেন। আলী ইবনে আবূ তালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবীর পা আহত হওয়ার পর নবী করীম-ﷺ-হাত বুলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। আনাস ইবনে মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দুআ করেন। আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে, তাঁর ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়; তাঁর খেজুর গাছ বছরে দু'বার ফল দিতে লাগে, অথচ এ কথা সুবিদিত যে, খেজুর গাছে বছরে একবারই খেজুর আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদের একজন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে অনাবৃষ্টি ও খরার অভিযোগ করলে তিনি মিম্বার থেকেই দুআর জন্য হাত উঠান। আর তখন আকাশে কোনো মেঘ ছিল না। হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে গেল এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মুষল ধারায় বৃষ্টি হল। ফলে আবার অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দুআ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। মানুষ রৌদ্রের মাঝে বের হয়ে গেল।

একটি ছাগল ও এক 'সাআ' (আড়াই কিলো গ্রাম) যব দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে খাওয়ান। সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যান, কিন্তু খাবার সামান্যও কম হয়নি। অনুরূপভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান, যে খেজুর বাশির ইবনে সা'দের কন্যা তার পিতা ও মামার জন্য এনেছিল এবং আবূ হুরাইরার স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। তাঁকে

(রাসূলকে) হত্যা করার জন্য অপেক্ষারত এক শ'জন কুরাইশী ব্যক্তির মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নি। তিনি তাদের নাকের ডগায় চলে যান। সুরাক্বা ইবনে মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে। যখন সে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তিনি তার জন্য বদ্দুআ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে যায়। আরো বহু মু'জিযা তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আর তা সবই ছিল মহান আল্লাহ পক্ষ হতে তাঁর নবূওয়াতের সত্যতার সমর্থনে।

ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়াদি

১। আল্লাহর উপর ঈমান আনা

আল্লাহর উপর ঈমান আনা হল দ্বীনের মূল বিষয়। আর আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হল, তাঁর অস্তিত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক ও সবার মালিক। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সার্বভৌমত্বের পরিচালক। তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি পূর্ণ গুণে গুণান্বিত। তিনি সব রকমের দোষ-ত্রুটি ও সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পাক ও পবিত্র। যখন কেউ বিশ্ব-জাহান ও বিশ্বে বিদ্যমান সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন সে অবগত হয় যে, এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেনি। আর এটাও সম্ভব নয় যে, কোনো কিছু স্রষ্টা ছাড়াই হয়ে গেছে। বরং এ সবের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ।

২। ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা

ফেরেশতাকুল হলেন এক অদৃশ্য জগৎ। তাঁরা সৃষ্ট। তাঁরা মহান আল্লাহর ইবাদত করেন। তাঁদের মধ্যে রুবূবিয়াত তথা প্রতিপালকত্বের এবং উলূ-হিয়াত তথা উপাস্যত্বের গুণাবলীর কোনো কিছুই নেই। মহান আল্লাহ

তাঁদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করার ও তা কার্যকরী করার পূর্ণ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম তাঁদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখে। আর এ বিশ্বাসও রাখে যে, তাঁরা সংখ্যায় অনেক। আল্লাহ ছাড়া তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। অনুরূপ যাঁদের নাম জানা গেছে, তাঁদেরকে তাঁদের নামসহ বিশ্বাস করতে হয়। যেমন, জিবরীল, মালিক ও মীকায়ীল প্রভৃতি। আর তাঁদের যে গুণাবলী সম্পর্কে জানা গেছে, সে গুণাবলীর উপরেও বিশ্বাস রাখতে হয়।

৩। গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনা

মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সত্যের প্রকাশ ও তার প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য পূর্বের কিছু নবী ও রাসূলদের উপর কয়েকটি গ্রন্থ নাযিল করেছিলেন। যেমন, মূসা-عليه السلام-এর উপর তাওরাত। ঈসা-عليه السلام-এর উপর ইঞ্জীল এবং দাঊদ-عليه السلام-এর উপর যাবূর। আর যে কুরআন আল্লাহ শেষ নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর নাযিল করেছেন, তার উপরও বিশ্বাস রাখে।

কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে মানবতার জন্য শেষ পায়গাম। কুরআন যা নিয়ে এসেছে, তা ছাড়া অন্য কোনো আমল কারো পক্ষ হতে কবুল করবেন না। কুরআন হল পূর্বের গ্রন্থসমূহের প্রধান ও তার সত্যায়নকারী। কুরআনের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহর তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাতে কোনো বিকৃতি ও পরিবর্তন সূচিত হবে না। পূর্বের কিতাব-গুলি এর বিপরীত। তাতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কারণ, মহান আল্লাহ কুরআনের মত পূর্বের কিতাবগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।

কুরআন সাহিত্য ও বাচনভঙ্গীর দিক দিয়ে অতীব সুন্দর ও চমৎকার গ্রন্থ। আর আইনপ্রণয়নের দিক দিয়ে তা পূর্ণ এক সংবিধানপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ ঐশ্বরিক ও অদৃশ্য সম্পর্কে এমন তথ্য দিয়েছে, যা কোনো মানুষ জানে না এবং মানুষের জ্ঞান তা নিজে নিজেই জানতে সক্ষমও নয়। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে এ কিতাব এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর যুগেও কেউ জানতো না, তাঁর পরের যুগেও না এবং তাঁর পর আগত দশযুগ পর্যন্ত কেউ জানতো না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন প্রকৃতিবিজ্ঞান (Natural science)-এর প্রতি, যা জানা গেছে মুহাম্মাদ-ﷺ-এর ১৩০০ বছর পর। আর অনেক তথ্য তো এখনো জানা যায়নি। এ এমন একটি গ্রন্থ, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, তারা তার সূরার মত দশটি সূরা এনে দেখাক তো। অথবা কম-সে-কম একটি সূরা এনে দেখাক তো। সবাই তা আনতে অপারগ হয়েছে। আর এ চ্যালেঞ্জ আজও অব্যাহত আছে এবং আজ পর্যন্ত অপরাগতাও অব্যাহত রয়েছে। কুরআনের চমৎ-কারিতা সুসাব্যস্ত। আর তার চমৎকারিতা কেবল শব্দালঙ্কার, অদৃশ্য বিষয়ের খবর দেওয়া এবং আইনপ্রণয়নের মধ্যে সীমিত নয়, বরং তার পুরোটাই চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ।

৪। রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ মানুষদেরকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য এবং এর বিপরীত জিনিসকে বর্জন করার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রুবূবিয়াত তথা প্রতিপালকত্বের এবং উলূ-হিয়াত তথা উপাস্যত্বের গুণাবলীর কোনো কিছুই ছিল না। মানব গুণের সব কিছুই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন, পানাহারের প্রয়োজনীয়তা,

অসুস্থতা ও মৃত্যু ইত্যাদি। তাঁরা ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তাঁদেরকে রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এ বিশ্বাসও তাঁদের উপর ঈমান আনার আওতাভুক্ত বিষয় যে, তাঁদের নবূওয়াত সত্য ছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা গেছে, তাঁদেরকে তাঁদের নামসহ বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁদের জানানো বিষয়গুলিকেও সত্য মনে করতে হবে। তবে আমল করতে হবে শেষ নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর শরীয়ত অনুযায়ী। কারণ, মুহাম্মাদ-ﷺ-প্রেরিত হওয়ার পর অন্য কোনো শরীয়ত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

৫। শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

শেষ দিবস বলতে কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। এ দিন আল্লাহ হিসাব ও প্রতিদানের জন্য মানুষদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। 'শেষ দিবস' বলা হয়েছে, কারণ, এর পর কোনো দিন নেই। জান্নাতীরা জান্নাতেই অবস্থান করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে। শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসের অর্থ হল, তার আগমনের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং এই বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা। শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তিনটি জিনিসকে মানতে হয়। আর তা হল,

(ক) পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা

অর্থাৎ, বিশ্বাস করা যে, মৃতদের পুনরায় জীবিত করা হবে। মানুষদেরকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন। তাদেরকে কবর থেকে খালি পা, উলঙ্গ শরীর ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠাবেন।

(খ) প্রতিদান ও হিসাব-কিতাবকে বিশ্বাস করা

অর্থাৎ, সেখানে মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের তার দুনিয়ার কৃতকর্মের হিসাব নিবেন এবং তার প্রতিদান দিবেন। সুতরাং যে আনুগত্য করবে

এবং ঈমান এনে সৎকর্ম করবে, তার জন্য হবে জান্নাত। আর যে অবাধ্যতা ও কুফরী করবে, তার জন্য হবে জাহান্নাম। আর এই হিসাব হওয়া ও প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর সুকৌশলেরই দাবী। কারণ, তিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল-মন্দ জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের উপর তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যকে অপরিহার্য করেছেন। এখন দেখা যায় যে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেউ মু'মিন ও কেউ কাফের। অতএব, তাঁর হিকমত ও সুকৌশলের দাবীতে এটা উচিত ও সুবিচার হবে না যে, এদের সবার সাথে সমান আচরণ করা হোক। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

"আমি কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব? তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?

(গ) জান্নাত ও জাহান্নামকে বিশ্বাস করা

জান্নাত ও জাহান্নাম হচ্ছে সৃষ্টির চিরস্থায়ী আবাস। জান্নাত হচ্ছে ভোগ-বিলাসের আবাস যা আল্লাহ তাঁর সেই মু'মিন আল্লাহভীরুদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যাঁরা সেই সব জিনিসের উপর ঈমান এনেছে, যার উপর ঈমান আনা আল্লাহ তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন। তারা আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে। নেক আমলের আলোকে জান্নাতে জান্নাতবাসীদের স্তরের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। আর জাহান্নাম হল শাস্তির জায়গা। এ স্থান এমন অত্যাচারী ও কাফেরদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত যারা তাঁর সাথে কুফরী করেছে এবং তাঁর রাসূলদের অবাধ্যতা করেছে। আর জাহান্নাম অতীব নীচ স্থান। সেখানে জাহান্নামীদের অসৎকর্ম অনুপাতে শাস্তির মধ্যেও পার্থক্য থাকবে।

৬। ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

অর্থাৎ, মানুষকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যা ঘটছে, যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে পারে এ সব সম্পর্কে মহান আল্লাহ অবহিত। আর এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ যা চাইবেন, তা-ই হবে এবং তিনি যা চাইবেন না, তা হবে না। অনুরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, যা কিছু সংঘটিত হয় তা তাঁর ইচ্ছাতেই হয় এবং সে সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকেন।

ইসলামে ইবাদত

ইসলামে ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হয় না, যতক্ষণ না তা কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-এর আনীত তরীকা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। যেমন, নামায একটি (মহান) ইবাদত তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। অনুরূপ তা সেই পদ্ধতিতেই সম্পাদন করতে হবে, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বর্ণনা করেছেন। আর এ রকম করতে হয় কয়েকটি কারণের ভিত্তিতে। আর তা হল,

১। আল্লাহ নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদত করলে তা শির্ক গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء:٣٦]

“তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।” (সূরা নিসা ৩৬)

২। আল্লাহই একমাত্র শরীয়তপ্রণেতা। এ অধিকার কেবল তাঁরই। সুতরাং কেউ যদি এমন কারো ইবাদত করে, যা বিধেয় নয়, তাহলে শরীয়ত-প্রণয়নে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে।

৩। আল্লাহ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কেউ যদি নিজের পক্ষ হতে কোনো কিছু আবিষ্কার করে, তাহলে সে দ্বীনে ঘাটতি থাকার অপবাদ-দাতা গণ্য হবে।

৪। যদি মানুষের জন্য এই অনুমতি থাকত যে, তারা যার চায় এবং যেভাবে চায় ইবাদত করুক, তাহলে প্রত্যেক মানুষের ইবাদত করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি হত। কারণ, সবার পছন্দ এক রকম নয়।

ইসলামের রূকনসমূহ

ইসলামের যে রূকনগুলির আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা হল, পাঁচটি। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর রাসূল। (২) নামায পড়া (৩) যাকাত দেওয়া। (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা। (৫) আল্লাহর পবিত্র ঘরের হজ্জ করা।

ইসলামের রূকনগুলির অর্থ

১। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর রাসূল। এই সাক্ষ্যের অর্থ হল, জবান দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ-ﷺ-হলেন আল্লাহর দূত, তাঁর বার্তাবাহক। সুতরাং আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান এবং রাসূলের অনুগতশীল না হলে, কারো ইসলাম ও কোনো আমল গৃহীত হবে না। আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-এর অর্থ হল, মানুষকে আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে পাঠ করতে হবে যে, আল্লাহই সত্য উপাস্য।

কেবল মৌখিক আবৃতি যথেষ্ট নয়। অনুরূপ তার দাবী অনুযায়ী আমল করাও অপরিহার্য। তার সমস্ত দাবীকে মেনে নিয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেকে নত করে দিতে হবে। 'মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর দূত' কথার অর্থ হল, তাঁর নির্দেশ পালন করা। তাঁর আনীত বিষয়াদির সত্যায়ন করা। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁরই তরীকায় আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা।

২। নামায পড়া

রাতে ও দিনে পাঁচবার ফরয নামায আদায় করাকে ইসলাম অপরিহার্য করেছে। আর তা হল, ফজরের নামায, যোহর, আসর, মাগরিব নামায এবং ইশার নামায।

৩। যাকাত দেওয়া

যাকাত হল ধন-সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গরীব-অভাবীদের উপর ব্যয় করা, যারা তা পাওয়ার যোগ্য। আর যাকাতের উপকারিতা হল, এতে কৃপণতার দোষ থেকে আত্মা পবিত্র হয়। অভাবগ্রস্ত মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়। পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়। স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অন্যের প্রতি অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

৪। রমযানের রোযা

রোযা হল, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে রমযান মাসের দিনে পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার নাম। একজন মুসলিম মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে পুরো রমযান মাস ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

পানাহার, যৌনক্ষুধা পূরণ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে। রোযার উপকারিতা হল, এতে আত্মা পবিত্র হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে অভ্যস্ত হয়। অনুরূপ ধৈর্য ধারণ ও কষ্ট সহ্য করতেও অভ্যস্ত হয়। রোযার আরো উপকারিতা হল, এতে আমলকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করার, আমানতের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রেরণা এবং অন্যের প্রতি অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে শারীরিক সুস্থতা লাভও এর দ্বারা অর্জিত হয়।

৫। হারাম ঘরের হজ্জ করা

এটা হল, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আল্লাহর পবিত্র ঘরের অভিমুখে যাত্রা করা এবং হজ্জের কার্যাদি সুসম্পূর্ণ করা। সামর্থ্যবানদের জন্য এটা কেবল জীবনে একবার পালন করতে হয়।

ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে ধর্মকে মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। ইসলাম সর্বযুগ ও সর্বস্থান উপযোগী। এমন কোনো কল্যাণ নেই, যা বলে দেয়নি এবং এমন কোনো অকল্যাণ নেই, যা থেকে সতর্ক করে দেয়নি। ইসলামকে অবলম্বন করা এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন ব্যতীত মানবতা না স্বস্তি লাভ করতে পারবে, আর না সুখ-শান্তি। ইসলামের মাহাত্ম্যকে আরো জোরদার হয় তার কিছু এমন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, যা অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। আর যে বৈশিষ্ট্য-গুলির কারণে ইসলাম অন্য ধর্ম থেকে একেবারে পৃথক ধর্ম ও তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত করে তা হল নিম্নরূপঃ

১। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। আর বান্দাদের জন্য কি প্রয়োজন এ ব্যাপারে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন,

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।” (সূরা মুলক ১৪)

২। ইসলাম মানুষের শুরু ও শেষ সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এবং কেন তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কথাও জানিয়ে দেয়। এ জীবনে যে পথে চলা তাদের জন্য জরুরী তাও পরিষ্কার করে বলে দেয় এবং যেসব জিনিস থেকে বিরত থাকা তাদের উপর অপিরহার্য, সেগুলোও তাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়। মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء:١]

“হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু’জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন।” (সূরা নিসা ১) তিনি আরো বলেন,

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه:٥٥]

“এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরেক উত্থিত করব।” (সূরা ত্বা-হা ৫৫) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা যেন আমারই ইবাদত করে।" (সূরা যা-রিয়াত ৫৬)

৩। ইসলাম হল প্রকৃতির ধর্ম। তাই প্রকৃতির সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الرُّوم:٣٠]

"এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রূম ৩০)

৪। ইসলাম জ্ঞানের মূল্যায়ন করে, চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দেয় এবং নিন্দা করে মূর্খতাকে, অন্ধ অনুকরণকে ও সঠিক চিন্তা-গবেষনা না করে উদাসীন থাকাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ [الزُّمر:٩]

"বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" (যুমার ৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

[آل عمران:١٩٠-١٩١]

“নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।” (সূরা আল-ইমরান ১৯০-১৯১)

৫। ইসলাম আক্বীদা/বিশ্বাস ও বিধিসম্পন্ন দ্বীন। তা আক্বীদা ও বিধিগত দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। ইসলাম বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষনার আলোকে তৈরী করা কোনো দ্বীন নয়। বরং তা প্রত্যেক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। সঠিক বিশ্বাস, সুবিবেচিত আচার-আচরণ এবং উত্তম নৈতিকতা ইত্যাদি সবকিছুই তার মধ্যে শামিল আছে। ইসলাম হল সকল মানুষের ধর্ম। তা হল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধর্ম।

৬। ইসলাম মানবতা বোধের মূল্যায়ন করে। তার সঠিক পথ নির্দেশ ক’রে তাদের এই বোধকে কল্যাণকর ও গঠনমূলক কাজের অস্ত্র বানায়।

৭। ইসলাম সুবিচারপূর্ণ দ্বীন। শত্রু হোক বা বন্ধু, নিকটের হোক অথবা দূরের সবার সাথে ইসলাম সুবিচার করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ﴾ [النحل:٩٠] وقال: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام ١٥٢] وقال: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة:٨]

“অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সুবিচার করার নির্দেশ দেন।” (নাহল ৯০) তিনি আরো বলেন, “আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের

বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল।” (আনআম ১৫২) তিনি অন্যত্র বলেন, “কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর।” (সূরা মায়েদা ৮)

৮। ইসলাম সত্য ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। তাই সকল মুসলিমরা একে অপরের ধর্মীয় ভাই। দেশ, জাতীয়তাবাদ এবং বর্ণ ওদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করতে পারে না। ইসলামে না আছে কোনো শ্রেণীভাগ, না আছে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান, আর না আছে বর্ণের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ। ইসলামে পারস্পরিক মর্যাদায় পার্থক্য নির্দ্ধারিত হয় কেবল আল্লাহভীরুতার ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات ١٣]

“তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ-ভীরু।” (সূরা হুজুরা-ত ১৩)

৯। ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। তাই তার অনুসারীদেরকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছে এবং এর জন্য তাদেরকে মহাপুরস্কার দানের অঙ্গীকার করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।” (মুজাদালা ১১) তিনি আরো বলেন,

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ [الزُّمر:٩]

“বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা যুমার ৯) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ))

“জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।”

১০। যে ইসলামকে অবলম্বন ক’রে সঠিকভাবে তা বাস্তবায়িত করবে, তাকে আল্লাহ সুখ-সৌভাগ্য ও সম্মান দানের অঙ্গীকার করেছেন। তাতে তা এককভাবে হোক বা সম্মিলিতভাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور:٥٥]

“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী-দেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে-যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন-সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোনো অংশী করবে না।” (সূরা নূর ৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٩٧]

"পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখের জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" (সূরা নাহল ৯৭)

১১। ইসলাম প্রেম-প্রীতি, সামাজিকতা এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের ধর্ম। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)) [رواه البخاري ومسلم]

"মুমিনদেন আপসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোনো অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

"যারা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা তাদের প্রতি দয়া কর, যারা যমীনে থাকে, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" তিরমিযী) তিনি-ﷺ-আর একটি হাদীসে বলেছেন,

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [متفق عليه]

"ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

১২। ইসলাম সচেতনতাপূর্ণ ও শ্রম-সাধনার ধর্ম। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ)) [رواه مسلم]

"(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিষে যত্নবান হও যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয় তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম তাহলে এ রকম হত।' বরং বল, আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন।" (মুসলিম)

১৩। ইসলামের উক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিরোধ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء:٨٢]

"এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" (সুরা নিসা ৮২)

১৪। ইসলাম সুস্পষ্ট ও সহজ-সরল ধর্ম। প্রত্যেকেই সহজভাবেই ইসলামকে বুঝতে পারবে।

১৫। ইসলাম এক অবারিত ধর্ম। যে কেই তা শিখতে চায় এবং তাতে প্রবেশ করতে চায়, তার জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত।

১৬। ইসলাম সুন্দর নৈতিকতা ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف ١٩٩]

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।" (সূরা আ'রাফ ১৯৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصِّلت:٣٤]

"উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।" (সূরা হা-মীম সাজদা ৩৪) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ))

"সব থেকে অধিকহারে যে জিনিসটি লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তা হল, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র।" তিরমিযী) তিরি আরো বলেছেন,

((أَكْمَلُ النَّاسِ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا))

"মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার তো সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সব থেকে বেশী উন্নত।" (তিরমিযী) তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন,

((أحبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعَهُمْ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إلى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ جَوْعاً، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ

أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا)) الطبراني

"মানুষের সব থেকে বেশী উপকারকারী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়। আর আল্লাহর নিকট সব চেয়ে উত্তম কাজ হল, এমন আনন্দ যা তুমি কোনো মুসলিমের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছ কিংবা তার কোনো কষ্ট দূর করেছ অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছ বা তার ক্ষুধা নিবারণ করেছ। আমি যদি আমার কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাই, তাহলে এটা আমার নিকট মসজিদে এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়েও শ্রেয়।" (তাবরানী)

১৭। ইসলাম জ্ঞান-বুদ্ধির সংরক্ষণ করে। তাই মাদকদ্রব্য, হে'রোইন এবং এমন সব জিনিসকে হারাম করেছে, যা জ্ঞানের বিকৃতি ঘটায় ও প্রাণ নাশের কারণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء ٢٩]

"আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" (সূরা নিসা ২৯)

১৮। ইসলাম ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করে। তাই আমানতদার হওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। আমানতদারদের প্রশংসা করেছে এবং তাদের সুন্দর জীবন ও জান্নাত দানের অঙ্গীকারও করেছে। চুরি করাকে হারাম করেছে এবং এ কাজে জড়িত ব্যক্তিকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে শাস্তি দানের ধমকও দিয়েছে। যাতে কেউ ধন-সম্পদ চুরি ও কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সাহস না করে।

১৯। ইসলাম জানের হিফাযত করেছে। তাই হত্যাকে হারাম করেছে এবং হত্যাকারীকেও হত্যা করার শাস্তি দেওয়ার সাথে আখেরাতে চিরস্থায়ী

জাহান্নামী হওয়ার ধমকও শুনিয়েছে। আর এ কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে, যে মুসলিম দেশে ইসলামের এই নির্দেশের বাস্তব রূপ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে হত্যার সংখ্যা অনেক কম। কারণ, যখন কোনো মানুষ জেনে নিবে যে, সে যদি কাউকে হত্যা করে, তবে তাকেও হত্যা করা হবে, তাহলে সে অবশ্যই হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। আর এইভাবে মানুষের জান অপরা-ধীদের অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

২০। ইসলাম (শারীরিক) সুস্থতারও যত্ন নিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف ٣١]

"খাও এবং পান কর, তবে অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারী-দেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফ ৩১) আলেমগণ বলছেন, এই আয়াতে সমস্ত চিকিৎসা বিদ্যাকে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, সুস্থতার সব চেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে পরিমিত পানাহার। অনুরূপ ইসলামের মাদকদ্রব্যকে হারাম করাও শারীরিক সুস্থতার সংরক্ষণ রাখার পর্যায়ভুক্ত বিষয়। কারণ, এতে যে কত ক্ষতি তা কারো নিকট গোপন নয়। এইভাবে ইসলাম ব্যভিচার ও সমলিঙ্গ ব্যভিচারকে হারাম করেছে। এতে যে বহু ক্ষতির শিকার হতে হয়, তা কারো অজানা নয়। এতে শারীরিক সুস্থতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, যৌনব্যাধি, মুত্ররোগ, চর্মরোগ এবং এডস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়া।

২১। ইসলাম নিয়ম-নিতীর আওতায় স্বাধীনতার জামিন হয়। তাই মানুষ তার কেনা-বেচায় এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যে ও তার চলাফেরা ইত্যাদিতে স্বাধীন। তবে ধোঁকা-প্রতারণা ও ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি ক'রে এ স্বাধীনতা যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে সেদিকে খেয়াল

রাখতে হবে। অনুরূপ মানুষ দুনিয়ার পাক ও বৈধ জিনিস দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করার ব্যাপারেও স্বাধীন। যেমন, পানাহার, ঘ্রাণগ্রহণ ও পরিধান। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এ তৃপ্তি গ্রহণ এমন কোনো হারাম জিনিস দ্বারা যেন না হয়, যার ক্ষতি তার উপর অথবা অন্য কারো উপর আসতে পারে।

ইসলামের সুন্দর কিছু দিক

ইসলাম এসেছে মানুষকে সেই সমস্ত জিনিস শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যা দুনিয়াতে তাদের প্রয়োজন এবং যা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সুখ-সৌভাগ্য লাভের মাধ্যম। ইসলামের সুন্দর কিছু দিক তার আদেশাবলী ও নিষেধাবলী থেকে ফুটে উঠে।

প্রথমতঃ ইসলামের আদেশাবলী থেকে যে সুন্দর দিকগুলি ফুটে উঠে তা হল,

১। ইসলাম মানুষকে এমন জিনিসের নির্দেশ দেয়, যার দ্বারা সে অন্যান্য জীবজন্তুর সাদৃশ্য থেকে অথবা স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। অনুরূপ তার মান-মর্যাদা এত উঁচু করে দেয় যে, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে না কোনো সৃষ্টির সম্মান করতে পারে, আর না স্বীয় প্রতিপালক ছাড়া অন্য কারো সামনে নত হতে পারে।

২। ইসলাম বুদ্ধি-বিবেক ও অঙ্গ-প্রতঙ্গকে দ্বীন ও দুনিয়ার এমন লাভ-দায়ক কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়, যার জন্য তা সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩। ইসলাম ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য স্বচ্ছ করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া সমস্ত বাতিল উপাস্যকে বর্জন করতে বলে।

৪। ইসলাম মানুষের প্রয়োজন পূরণের ও তাদের সহযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

৫। ইসলাম অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার, জানাযায় শরীক হওয়ার, কবরের যিয়ারত করার এবং মুসলিমদের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়।

৬। ইসলাম মানুষের সাথে সুবিচার করার নির্দেশ দেয়। তাদের উপর যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করে। আর নির্দেশ দেয় যে, মানুষ নিজে যা ভালবাসে, তা যেন সে অপরের জন্যও বাসে।

৭। ইসলাম জীবিকার্জনের জন্য শ্রম-সাধনা করার নির্দেশ দেয়। মানুষ যেন আত্মসম্মান রক্ষা করে। অপরের কাছে হাত পেতে সে যেন নিজেকে লাঞ্ছিত ও খাট না করে।

৮। ইসলাম সৃষ্টির প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। সুন্দরভাবে তাদের যেন যত্ন নেয়। তাদের যেন উপকার করার চেষ্টা করে এবং তাদের থেকে অনিষ্টকারিতা যেন দূর করে।

৯। ইসলাম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে বলে। প্রতিবেশীর সম্মান করতে বলে এবং জীব-জন্তুর প্রতি দয়া দেখাতে বলে।

১০। ইসলাম সাথী-সঙ্গীদেরকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে বলে এবং স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ পেশ করতে বলে।

১১। ইসলাম আমানতের সংরক্ষণ ও অঙ্গীকার পূরণ করতে বলে। ধারণা ভাল রাখতে বলে। কার্যকলাপে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে এবং ভাল-কাজের ব্যাপারে ত্বরা করতে বলে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও ইসলামের আরো বহু সুন্দর দিক রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের নিষেধাবলী থেকেও ইসলামের বহু সুন্দর দিক ফুটে উঠে। আর তা হল নিম্নরূপ,

ইসলামে যেসব নিষেধাবলী এসেছে, তাতেও বহু সুন্দর দিক রয়েছে। কারণ, মুসলিমকে অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং নোংরা

ও অশ্লীল কাজের মন্দ পরিণামের কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে সকলেই এমন সমাজে বসবাস করে, যা হবে (সব দিক দিয়ে) নিরাপদ। ইসলাম যা করতে নিষেধ করেছে তা হল,

১। কুফরী ও শির্ক করতে নিষেধ করেছে।

২। অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ এবং আত্মগর্ব ও বিপদগ্রস্তদের নিয়ে হাসা-হাসি করতে নিষেধ করেছে।

৩। মন্দ ধারণা, (কোনো কিছুকে) অশুভ গণ্য করতে, নিরাশ হতে এবং কৃপণতা ও অপচয় করতে নিষেধ করেছে।

৪। অলসতা, কাপুরুষতা, দুর্বলতা ও অকর্মণ্যর্তা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছে। অনুরূপ দ্রুততা, অসভ্যতা, নির্লজ্জতা দেখাতে, হা-হুতাশ করতে, অপারগতা, ক্রোধ, হঠকারিতা এবং যা হাত ছাড়া হয়ে গেছে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে।

৫। অবাধ্যতা এবং কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতে নিষেধ করেছে। কারণ, তা এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে বাধা দেয়।

৬। গীবত করতে নিষেধ করেছে। আর গীবত হল, মানুষের এমন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা, যা তারা অপছন্দ করে। অনুরূপ চুগলী করতেও নিষেধ করেছে। আর চুগলী হল, ঝগড়া-বিবাদ বাঁধানোর উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়া।

৭। অনর্থক কথা বেশী বলতে নিষেধ করেছে। গোপন রহস্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে। মানুষের সাথে উপহাস করতে এবং অপরের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে নিষেধ করেছে।

৮। গালমন্দ ও অভিসম্পাত করতে এবং মন্দ নামে ডাকতে নিষেধ করেছে।

৯। বেশী তর্কবিতর্ক ও ঝগড়াঝাটি করতে নিষেধ করেছে। অনুরূপ এমন অসভ্য হাসি-ঠাট্টা করতেও নিষেধ করেছে, যা মন্দের দিকে নিয়ে যায়।

১০। সত্য সাক্ষি গোপন করতে ও মিথ্যা সাক্ষি দিতে নিষেধ করেছে। কোনো সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ এবং মৃতদের গালি দিতে ও ইলমকে গোপন করতে নিষেধ করেছে।

১১। নির্বুদ্ধিতা ও অশ্লীলতা হতে, কাউকে দান ক'রে খোঁটা দিতে এবং যে তোমার কোনো মঙ্গল করে তার অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করেছে।

১২। বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্ত করতে এবং ওয়াদা-চুক্তি ভঙ্গ করতে নিষেধ করেছে।

১৩। পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং সন্তানদের প্রতি অযত্নবান হতে নিষেধ করেছে।

১৪। জাসুসী ক'রে মানুষের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছে।

১৫। পুরুষদেরকে মহিলাদের এবং মহিলাদেরকে পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে।

১৬। মদপান ও অন্যান্য নেশা করতে নিষেধ করেছে। অনুরূপ জুয়া-লটারি নিষেধ করেছে। কারণ, এতে মাল-ধন ধ্বংসের শিকার হয়।

১৭। মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্যের প্রচার করতে, মাপে কম দিতে, হারাম কাজে মাল ব্যয় করতে এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছে।

১৮। চুরি করতে, ছিনতাই করতে, কোনো অংশীদারের অপর অংশীদারের সাথে বিশ্বাসঘতকতা করতে, শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে দেরী করতে

অথবা তার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার পারিশ্রমিক দেওয়া থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছে।

১৯। এত বেশী খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছে, যা ভক্ষণকারীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

২০। সম্পর্ক ছিন্ন করতে, শত্রুতা পোষণ করতে এবং একে অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করেছে। আর সতর্ক করেছে যে, কোনো মুসলিম যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ না করে।

২১। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কাউকে প্রহার করতে ও মানুষদের অস্ত্র দ্বারা ভয় দেখাতে নিষেধ করেছে।

২২। ব্যভিচার ও সমলিঙ্গ ব্যভিচার করতে এবং প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছে।

২৩। ঘুষ নিতে ও দিতে নিষেধ করেছে।

২৪। সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছে।

২৫। কোনো মানুষের বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া উঁকিঝুঁকি মারতে নিষেধ করেছে। অনুরূপ এমন জনগোষ্ঠীর কথা শুনবার জন্য কান পাততে নিষেধ করেছে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না।

শেষ দিবস

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে শেষ দিবসের ব্যাপারে ক্বুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতে যা এসেছে, তার উপর ঈমান আনবে। সেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل:١٧]

"যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে।" (সূরা মুযাম্মিল ১৭) শেষ দিবস সম্পর্কীয় যে জিনিসগুলির উপর আনতে হয় তা হল,

মৃত্যু

এই পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران:]

"প্রত্যে প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা আল-ঈমান ১৮৫) তিনি আরো বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن:٢٦]

"এ পৃথিবীতে সবই ধ্বংসশীল।" (সূরা আর-রাহমান ২৬) তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾[الزمر:٣٠]

"তুমিও মৃত্যু বরণ করবে আর তারাও মরবে।" (সূরা যুমার ৩০) এ বিশ্বে কোনো মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الانبياء:]

"চিরন্তনতা তো তোমার পূর্বের কোনো মানুষের জন্য সাব্যস্ত করে দিইনি।" (সূরা আম্বিয়া ৩৪)

মৃত্যু সম্পর্কীয় কিছু বিষয়

১। অধিকাংশ মানুষই মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন, অথচ তা হল এমন সুনিশ্চত জিনিস যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মৃত ব্যক্তি তার সাথে স্বীয় কবরে পার্থিব সামগ্রীর কোনো কিছুই বয়ে নিয়ে যাবে না। তার সাথে থাকবে কেবল তার আমল। আমল যদি ভাল হয়, তাহলে সে মুক্তি পেয়ে সুখের জীবন লাভ করবে। অন্যথায় অসফল হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২। মানুষের জীবনের সময়সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সুতরাং কেউ জানে না যে, সে কখন মরবে অথবা কোন্ স্থানে মরবে। কারণ, এটা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও এককভাবে মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু যখন এসে যাবে, তখন তা প্রতিহত করা অথবা পিছিয়ে দেওয়া কিংবা তা থেকে পলায়ন করা সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

[لأعراف:٣٤]

"আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।" (সূরা আ'রাফ ৩৪)

৪। মু'মিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মালাকুল মাউত (আত্মা কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা) মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হোন। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ। তাঁর সাথে থাকেন রহমতের ফেরেশতা, যাঁরা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصِّلت:٣٠]

“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর তারা এরই উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের নিকট ফেরশ্‌তারগণ অবতরণ করেন (আর তারা বলেন,) ভয় করো না এবং চিন্তা করো না। তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে নাও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।” (সূরা ফুসসিলাত ৩০)

পক্ষান্তরে সে (মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি) যদি কাফের হয়, তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ ক’রে ও কালো চেহারা নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হোন এবং তাঁর সাথে থাকেন আযাবের ফেরেশতা, যাঁরা তাকে আযাবের দুঃসংবাদ দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]

“যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা) যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রায় থাকবে, আর ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরেক অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।” (সূরা আনআম ৯৩)

মৃত্যু এসে গেলে সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব প্রত্যেক মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠]

"যখন তাদের (পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি। না, এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র, তাদের সামনে (এখন) বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা মূ'মিনূন ৯৯) মৃত্যু এসে গেলে কাফের ও পাপী সৎকর্মাদি সম্পাদন করার জন্য পুনরায় পর্থিব জীবনে ফিরে যেতে চাইবে। কিন্তু সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ততা কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشُّورى:٤٤]

"আর অত্যাচারিরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, আমাদের কি ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে?" (সূরা আশ-শূরা 44)

৫। মহান আল্লাহর তাঁর বান্দাদের প্রতি এটা এক বিশেষ দয়া যে, যার মৃত্যুর পূর্বে শেষ বাক্য হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [رواه أبوداود]

“যার শেষ বাক্য হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

কবর

কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। যে কবরে মুক্তি লাভ করবে, পরবর্তী মঞ্জিলগুলি তার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে কবরে মুক্তি লাভ করবে না, পরবর্তী মঞ্জিলগুলিতে তাকে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ)) قَالَ: ((يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟)) قَالَ: ((فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)) قَالَ: ((فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الجَنَّةِ)) قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ((فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا)) ((وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ)) [رواه البخاري ومسلم ١٣٣٨، ٢٨٧٠]

“বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী-সঙ্গীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। দু’জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং তাকে বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, সে যদি মু’মিন হয়, তহলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, দেখো,

জাহান্নামে তোমার একটি স্থান ছিল, তার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, সে তখন উভয় স্থানই অবলোকন করবে। পক্ষান্তরে কাফের অথবা মুনাফিক্ব হলে বলবে, আমি জানি না, লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তোমার কোনো জ্ঞান ছিল, আর না তাদের অনুসরণ করেছিলে, যাদের জ্ঞান ছিল। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার ঘাড়ের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত করা হবে। ফলে সে এমন চিৎকার করবে যে, মানুষ ও জ্বিন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছুই তা (চিৎকার) শুনতে পাবে।" (বুখারী ১৩৩৮, মুসলিম ২৮৭০)

কবরে মানুষের দেহে আত্মা ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সম্পর্কীয় তাই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। তবে মুসলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত ব্যক্ত করেছেন যে, মানুষ যদি মু'মিন হয়, অফুরন্ত সুখ-শান্তি পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহেল সে তার কবরে আরাম উপভোগ করবে। আর যদি সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়, আল্লাহ যদি তাক মাফ না করেন, তাহলে শাস্তি ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر:]

"সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে), ফিরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" (সূরা গাফির ৪৬) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) [رواه مسلم ٢٨٦٧]

“কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।” (মুসলিম ২৮৬৭) সুস্থ বিবেক তা (কবরের আযাবের কথা) অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, মানুষ পার্থিব জীবনে তার কাছাকাছি জিনিস দেখে। ঘুমন্ত মানুষ অনুভব করে যে, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর সে চিৎকার ক’রে সাহায্য প্রর্থনা করছে, কিন্তু তার পাশের ব্যক্তি এ সম্পর্কে কিছুই অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মরণের মধ্যে বিরাট তফাৎ।

কবরের শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)) [رواه الترمذي ٢٣٠٨]

“কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এখানে পরিত্রাণ পেয়ে যায়, তাহলে তার পরে পরিত্রাণ পাওয়া আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে পরিত্রাণ না পায়, তাহলে পরে পরিত্রাণ পাওয়া আরো কঠিন হয়ে যাবে।” (তিরমিযী ২২৩০) প্রত্যক মুসলিমের উচিত খুব বেশী বেশী কবরের আযাব থেকে পানাহ চাওয়া। বিশেষ করে নামাযের সালাম ফিরার পূর্বে। সেই সাথে পাপ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। পাপ হল, কবর ও জাহান্নামের আযবের প্রধান কারণ। ‘কবরের আযাব’ বলা হয়, কারণ, অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। তবে যে পানিতে ডুবে যায় অথবা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিংবা যাকে হিংস্র পশু খেয়ে ফেলে, তারাও বারযাখে আযাব ও আরাম ভোগ করে।

কবরের আযাব বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন, লোহার হাতুড়ি ইত্যাদি

দ্বারা আঘাত করা, কবরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়া, জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া, জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া এবং তার জঘন্য কাজগুলোর একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় মানুষের রূপ ধারণ ক'রে তার সাথে কবরে থাকা। বান্দা কাফের ও মুনাফিক্ব হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপী মু'মিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকারের হবে। আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যেতেও পারে।

পক্ষান্তরে মু'মিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবরকে তার জব্য প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আলো দিয়ে তার কবর সমুজ্জ্বল করা হবে। জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যেখান থেকে সুঘ্রাণ বাতাস তার কবরে প্রবেশ করবে এবং তার সৎকর্মসমূহকে এমন এক সুদর্শন ব্যক্তির রূপে রূপান্তরিত করা হবে যে, তার সংস্পর্শে সে বড়ই স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করবে।

কিয়ামত ও তার কিছু নিদর্শন

১। মহান আল্লাহ এই বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এমন একদিন আসবে যেদিন এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেদিনটাই হবে কিয়ামতের দিন। এটা এমন সত্য যে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر:٥٩]

"কিয়ামত অবশ্যই আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।" (সূরা গাফির ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ:٣]

“কাফেররা বলে, আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হবো না। বল, অবশ্যই তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতে হবে।” (সূরা সাবা ৩) আর কিয়ামত অতি নিকটেই। আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

কিয়ামত কখন হবে এ জ্ঞান অদৃশ্য সম্পর্কীয়, তাই এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সৃষ্টির কাউকে তিনি এ বিষয়ে অবগত করেননি। তিনি বলেন,

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾ [الأحزاب:٦٣]

“লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আর তোমাকে কিসে জানাবে? সম্ভবতঃ কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে।” (সূরা আহযাব ৬৩)

২। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। আর এটা এইভাবে যে, মহান আল্লাহ কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বে (এক প্রকার) সুঘ্রাণ বাতাস প্রেরণ করবেন, যা মু’মিনদের প্রাণ কবজ করে নিবে। আতঃপর তিনি যখন সৃষ্টিকুলকে মৃত্যু দিয়ে এবং দুনিয়াকে ধ্বংস ক’রে সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। মানুষ তা শোনার সাথে সাথেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ﴾ [الزمر: ٦٨]

“সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়।” (সূরা যুমার ৬৮) আর সেদিনটি শুক্রবার। অতঃপর ফেরেশকাকুল মৃত্যুবরণ করবেন। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ বেঁচে থাকবে না।

৩। মানুষের দেহ (কবরে) ক্ষয় হয়ে যাবে। পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত সারা দেহ মাটি খেয়ে ফলেব। তবে নবীদের দেহ মাটি খাবে না। আল্লাহ আকাশ হতে এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে দেহগুলোকে সজীব-সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থানের ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফীলকে জীবিক করবেন। অতঃপর তিনি শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দিবেন এবং আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে পুনরায় জীবিত করবেন। মানুষ তাদের কবরসমূহ থেকে ঐভাবেই উঠবে, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করে-ছিলেন। খালি পা, উলঙ্গ শরীর এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [يّس:٥١]

“যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতি-পালকের দিকে ছুটে আসবে।” (ইয়াসীন ৫১)

কবর হতে সর্বপ্রথম যিনি উঠবেন, তিনি হবেন শেষ নাবী, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ-ﷺ-। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশর প্রান্তর হবে এক প্রশস্ত-বিস্তৃত মাঠ। সূর্য সৃষ্টিকুলের অনেক নিকটে অলস্থান করবে।

মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বিচার-ফায়সালা ও হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা করবে। মহান আল্লাহ ফায়সালা ও হিসাব শুরু হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। আর তা হল চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়ে ধারালো পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। মানুষ নিজের আমল অনুসারে এ পুল পাড়ি দিবে। কেউ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুত ঘোড়ার গতিতে এ পুল অতিক্রম করবে। আবার কেউ কেউ দুই হাঁটুর উপর ভর করে চলে অতিক্রম করবে। উক্ত পুলের উপর এমন আঁকুশীও থাকবে, যা মানুষকে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে। কাফের ও গুনাহগার মু'মিনগণ (যাদের জন্য আল্লাহ দোযখের ফায়সালা দেবেন) পুল হতে দোযখে পড়ে যাবে। কাফেররা তো চিরতরে দোযখে থাকবে, তবে পাপীরা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে।

ফুলসিরাত পারি দিয়ে জান্নাতবাসীরা দোযখ ও জান্নাতের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে যেন পরস্পর বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। ফলে এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার কাছে অপর ভাইয়ের কোনো অধিকার রয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে এর বিনিময় নিয়ে নেয় এবং তারা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে এক ভেঁড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে জবাই করা হবে। জান্নাত ও জাহান্নামবাসী এটা দেখতে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরস্থায়ী হও, এর পর আর কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্য চিরন্তনতা, এর পর কোনো মৃত্যু নেই। কেউ যদি আনন্দ ও উল্লাসের কারণে মৃত্যু বরণ করত, তবে জান্নাতবাসীরা

করত। আর যদি কেউ দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেত, তবে জাহান্নামীরা মরে যেত।

জাহান্নাম ও তার আযাব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٤]

"তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বারা ২৪) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর সাহাবীদেরকে সম্বোধন ক'রে বললেন,

((نَارُكُمْ هَذِهِ- الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ-جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ)) قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا)) [رواه ابخاري ومسلم]

"তোমাদের এ আগুন যা আদম-সন্তানেরা জ্বলায়, সে আগুন হল জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটাই তো জ্বালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল, তিনি বললেন, এর মধ্যে আরো ৬৯ ভাগ (উত্তাপ ও গরম) বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের জ্বালানী শক্তি একই।" (বুখারী ৩২৬৫, মুসলিম ২৮৪৩)

জাহান্নামের সাতটি স্তর। আর প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের চেয়ে কঠোরতর হবে। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। এর আযাব সর্বাপেক্ষা কঠোর। জাহান্নামে কাফরদের শাস্তি অব্যাহত থাকবে, বন্ধ

হবে না। যতবারই জ্বলে পুড়ে (ছাই হয়ে) যাবে, পুনরায় চামড়া পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, যাত অধিকতর শাস্তি ভোগ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء:٥٦]

"তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দিব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে আযাব আস্বাদন করতে থাকে।" (সূরা নিসা ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦]

"পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক কাফেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা ফাত্বির ৩৬) আর জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে ও তাদের গলায় বেড়ী পরানো হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [ابراهيم: ٤٩-٥٠]

"সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শিকল দ্বারা বাঁধা অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করে রাখবে তাদের মুখমণ্ডল।" (সূরা ইব্রাহীম ৪৯-৫০)

জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ الْأَثِيمِ* كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ* كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾ [الدخان:٤٣-٤٨]

"নিশ্চয় যাক্কুম গাছ, পাপীর খাদ্য, গলিত তামার মত তা পেটের ভিতর ফুটবে।" (সূরা দুখান ৪৩-৪৮)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস থেকেও জাহান্নামে কঠোর শাস্তি এবং জান্নাতের চরম সুখের কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)) [رواه مسلم ٢٨٠٧]

"কিয়ামত দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে হবে দুনিয়ার সব চেয়ে সুখী ব্যক্তি। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান, তুমি কি কখনো উত্তম কিছু পেয়েছিলে? তোমার জীবনে কি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল? সে (উত্তরে) বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! এইভাবে জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন একজন মানুষকে আনা হবে, যে দুনিয়ায় সর্বাধিক দুখী ছিল। অতঃপর

তাকে জান্নাতে একবার (মাত্র) চুবানো হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান, তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলে? তোমার উপরে দিয়ে কি কখনো কোনো কঠিন সময় অতিবাহিত হয়েছিল? সে (উত্তরে) বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমার উপর দিয়ে কখনো কোনো কঠিন সময় অতিবাহিত হয়নি।” (মুসলিম ২৮০৭) কাফের জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ভুলে যাবে। মু’মিনও জান্নাতে সামান্য ক্ষণের জন্য প্রবেশ করে দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং দরিদ্রতা ও কঠিনতা ভুলে যাবে।

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত হল চিরস্থায়ী ও মর্যাদাপূর্ণ আবাস। এটা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তাঁর নেক বান্দাদের জন্য। তাতে আছে এমন নিয়ামত, যা কোনো চোখ দেখিনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তার (সঠিক) ধারণা উদিত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[السجدة:١٧]

“কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি (পুরস্কার) লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” (সাজদা ১৭) জান্নাতও বিভিন্ন স্তরের হবে। আমল অনুসারে মু’মিনদের স্তর সেখানে ভিন্ন ভিন্ন হবে। আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة:١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নতি করবেন।" (মুজাদালা ১১) সেখানে তারা খাবে ও পান করবে যা তাদের মন চাইবে। তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, এমন দুধের নহর, যার স্বাদে পরিবর্তন আসবে না, পরিশোধিত মধুর নহর এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তবে তাদের সে শারাব দুনিয়ার শারাবের মত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ* لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات: ٤٥-٤٧]

"তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র, সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান থাকবে না এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না।" (সা-ফফা-ত ৪৫-৪৭) সেখানে তারা হুরদেরকে বিবাহ করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হুরদের সম্পর্কে বলেছেন,

((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا)) [رواه البخاري ٢٧٩٦]

"জান্নাতের কোনো তরুণী যদি দুনিয়াবাসীর প্রতি উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যেকার মহাশূন্য আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে যাবে সুগন্ধিতে।" (বুখারী ২৭৯৬)

জান্নাতীদের সব চেয়ে বড় নিয়ামত হবে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ। তারা পেশাব-পায়খানা করবে না, পোঁটা ঝাড়বে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের এবং তাদের ঘাম মিস্কের মত (সুগন্ধিময়)

হবে। তাদের এ নিয়ামত অব্যাহত থাকবে। কোনো দিন শেষ হবে না এবং কমেও যাবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ)) [رواه مسلم ٢٨٣٦]

"যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে স্বাচ্ছন্দ্যে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনো শেষ হবে না।" (মুসলিম ২৮৩৬) জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ক'রে সবার শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতে) যে অংশটুকু পাবে, তা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশগুণ শ্রেয় হবে।

ইসলামে নারীর মান

ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কে উপস্থাপনের পূর্বে অন্যান্য জাতির নিকট তাদের মর্যাদা এবং তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হতো, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অতি আবশ্যক মনে করছি।

ইউনানদের নিকট মেয়েরা ছিল বেচাকেনার সামগ্রী। তাদের কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। সমস্ত অধিকার পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। মিরাস থেকে তারা ছিল বঞ্চিতা। ধন-সম্পদে তাদেরকে কোনো হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হত না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সুক্করাত্বের বক্তব্য হলো, 'পৃথিবীর অধঃপতনের বড় ও প্রধান কারণই হল নারীদের অস্তিত্ব। নারীরা হল এমন একটি বিষাক্ত বৃক্ষের মত, যার বাহ্যিক অতি সুন্দর কিন্তু চড়ুই পাখি যখনই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে।'

রোমকরা নারীদেরকে একটি আত্মাহীন বস্তু বলে গণ্য করত। নারীদের কোনো অধিকার এবং কোনো মূল্য তাদের নিকট ছিল না। তাদের কথা

হলো, নারীদের রুহ বা আত্মা নেই। তাই তাদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে শরীরে গরম ও ফুটন্ত তেল ঢেলে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়া হত। কখনো কখনো এই নিষ্পাপ নারীদেরকে দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে তাদের প্রাণ নাশ করা হত।

হিন্দু ধর্মে নারীদের অবস্থা আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট ছিল। তারা নারীকে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিত। (যাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়)

চীনারা বলে, নারীরা এমন যাতনাদায়ক পানি সদৃশ, যা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিকে ধুয়ে-মুছে বিনাশ করে দেয়। প্রত্যেক চীনার তার স্ত্রীকে বিক্রয় করার এবং জীবদ্দশায় তাকে সমাধিস্থ করার অধিকার ছিল।

ইয়াহুদীরা নারীদেরকে মনে করে এক অভিশপ্ত প্রাণী। কারণ, এই নারীই আদমকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাঁকে (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে বাধ্য করেছে। অনুরূপ তারা নারীকে অপবিত্রা মনে করে। তাই যখন তার মাসিক হয়, তখন সমস্ত ঘর ও তার স্পর্শকৃত সমস্ত বস্তু অপবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ ভায়ের উপস্থিতিতে পিতার সম্পদ থেকে সে মিরাসও পেতো না।

খ্রীষ্টানদের নিকট নারী হল, শয়তান। খ্রীষ্টান ধর্মের একজন পুরোহিতের কথা হল, মানব জাতির সাথে নারীর কোনো সম্পর্ক নেই। সাধু বুনাফান্তুর বলে, ‘যখন কোনো নারীকে দেখবে, তখন এটা মনে করবে না যে, তোমরা কোনো মানব মূর্তি দেখেছ, এমনকি কোনো চতুষ্পদ পশুও না, বরং যা দেখেছ, তা নিছক শয়তান। আর তা হতে যা শুন, তা হল, আজদাহার বাঁশি।’ ব্রিটিশ আইনানুসারে বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নারীরা দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হত না। নারীদের

ব্যক্তিগত কোনো অধিকার ছিলো না। সব রকমের মালিকানা থেকে তারা বঞ্চিত হত। এমনকি পরিহিত পোশাকটারও তারা মালিক হত না। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড পার্লামেন্টে এ আইন প্রণয়ন হয় যে, নারীদেরকে কোনো কিছুর উপর আধিপত্য দেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সপ্তম হেনরীর যুগে নারীদের জন্য ইঞ্জীল পাঠ নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ, তারা অপবিত্রা। নারীরা মানুষ কিনা এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণের জন্য ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে এটাই স্বীকৃতি পায় যে, নারীরা মানুষ, তবে তাদেরকে পুরুষের সেবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্রিটিশ আইনানুযায়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বিক্রয় করা বৈধ ছিল। ছয় পেনী (ব্রিটিশ মুদ্রা) পর্যন্ত তার মূল্য নির্দিষ্ট ছিল।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারীরা খুবই তুচ্ছ, ত্যাজ্য ও হেয় প্রতিপন্না ছিল। না তারা মিরাস পেত, না কোনো অধিকার। এমনকি তাদেরকে কোনো কিছু গণ্যই করা হত না। আবার অনেকে তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করত। অতঃপর নারীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে এবং নারী-পুরুষ সকলে সমান, পুরুষের ন্যায় তাদেরও অধিকার আছে-এর উদাত্ত ঘোষণা দিতে আবির্ভাব ঘটন ইসলামের। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات١٣]

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে

তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ-ভীরু।" (হুজরাত ১৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَن يَّعْمَلْ مِنَ الصاَّلِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْراً ﴾ [النساء١٢٤]

"আর যে নেক কাজ করবে-সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক-সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরনের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হক্কও নষ্ট হতে পারবে না।" (নিসা ১২৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا اْلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ [العنكبوت٨]

"আমরা মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (আনকাবুতঃ ৮) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَكْمَلُ المؤُمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا))

[رواه الترمذي ١١٦٢]

"মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে ঈমানে পূর্ণ ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১১৬২) আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحابَتِي؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:

((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَبُوْكَ)) [متفق عليه ٥٩٧١، ٢٥٤٨]

"মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহারের সর্বাধিক অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর সে বলল, তার পর কে? বললেন, তোমার মা। অতঃপর বলল, তার পর কে? বললেন, তোমার মা। তার পর কে? বললেন, তোমার বাপ।" (বুখারী ৫৯৭১-মুসলিম২৫৪৮) এই হল নারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ।

নারীর সাধারণ কিছু অধিকার

নারীর সাধারণ কিছু এমন অধিকার রয়েছে, যা তার নিজের জানা উচিত এবং তার এই অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তাহলে সে যখনই চাইবে তখনই এ অধিকারগুলো দ্বারা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। আর তার অধিকারগুলোর সার-সংক্ষিপ্ত হল,

১। মালিক হওয়ার অধিকারঃ নারী ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা, কলকার-খানা, উদ্যান, সোনা-রূপা ও বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশু সহ সব কিছুর মালিক হতে পারবে। চায় সে-স্ত্রী হোক, মা হোক অথবা কন্যা বা বোন হোক।

২। বিবাহ করার অধিকারঃ স্বামী নির্বাচন, খুলআ' কামনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার তার রয়েছে। আর নারীর এ অধিকার-গুলো প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত।

৩। তার উপর ওয়াজিব এমন বিষয়ের জ্ঞানার্জন করার অধিকারঃ যেমন, মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, ইবাদতসমূহ ও তা সম্পাদন করার তরীকা-পদ্ধতি সম্পর্কে জানা, তার উপর ওয়াজিব কর্তব্য ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানা, অত্যাবশ্যক শিষ্টাচারসমূহ এবং উৎকৃষ্ট

নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [محمد ٢٩]

"জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই।" (মুহাম্মাদ ২৯) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণীও রয়েছে, তিনি বলেছেন,

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) [ابن ماجة ٢٢٠]

"প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।" (ইবনে মাজা)

৪। নিজ ধন-সম্পদ থেকে সে (স্ত্রী) স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সাদক্বা করতে পরবে এবং নিজের উপর, স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতার উপর ব্যয় করতেও পারবে।

৫। ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অসীয়ত করার অধিকারঃ সে (স্ত্রী) তার জীবদ্দশায় স্বীয় মালের এক তৃতীয়াংশের অসীয়ত করতে পারবে এবং কোনো অভিযোগ আপত্তি ছাড়া তার মৃত্যুর পর অসীয়ত কার্যকর হবে। কারণ, অসীয়ত সাধারণতঃ ব্যক্তিগত অধিকার। এ অধিকার যেমনি পুরুষের রয়েছে, তেমনি নারীরও আছে। কারণ আল্লাহর সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে কেউ অমুখাপেক্ষী নয়। তবে শর্ত হল, অসীয়ত যেন সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী না হয়। আর এতেও পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান।

৬। পোশাক পরিধানের অধিকারঃ স্ত্রী রেশম ও সোনা যা চায় পরিধান করতে পারবে। তবে এ দু'টি পুরুষদের জন্য হারাম। আর এমন লোকদের সামনে শরীর খোলা রাখবে না, যাদের সামনে শরীর খোলা রাখা বৈধ নয়।

৭। নারী সর্বোৎকৃষ্ট মনোহরী ও সুন্দর পোশাক এবং হার ও গহনা পরতে পারবে।

৮। পানাহারের অধিকারঃ সে স্বীয় স্বাদ অনুপাতে যা ভাল লাগে ও পছন্দ হয়, তা-ই সে পানাহার করতে পারবে। পানাহারের ব্যাপারে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। যা হালাল, তা উভয়ের জন্য হালাল এবং যা হারাম, তা উভয়ের জন্য হারাম। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ [الأعراف٣١]

"পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারী-দেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফ ৩১) এ সম্বোধনে নারী-পুরুষ উভয়েই শামিল।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু বিশেষ অধিকার রয়েছে। আর স্ত্রীর এ অধিকার-গুলো স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়। নিম্নোক্ত জিনিসগুলো স্বামীর উপর স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় অধিকার, যা আল্লাহর বাণী প্রমাণ করে,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ [البقرة٢٢٨]

"নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (বাক্বারা ২২৮) স্বামীর দায়িত্ব হল, সেগুলো পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে আদায় করা। হ্যাঁ, স্ত্রী তার অধিকারের কোনো কিছু স্বামীকে ক্ষমা করতে চাইলে, তা সে করতে পারে।

১। স্বামী আর্থিক সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। স্ত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, চিকিৎসা ও বাসস্থান এই ব্যয়ভারের আওতায় পড়বে।

২। স্বামী স্ত্রীর মান-সম্ভ্রম, দেহ, অর্থ-সম্পদ ও তার দ্বীনের সংরক্ষণ করবে।

৩। তাকে দ্বীনের জরুরী বিষয়াদির শিক্ষা দেওয়া। তবে স্বামী তাতে অক্ষম হলে, অন্ততপক্ষে তাকে মহিলাদের জন্য আয়োজিত ইসলামের সমাবেশ -গুলোতে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া। তা মসজিদ, মাদ্রাসায় হোক বা অন্য কোথাও।

৪। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করবে।

﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ [النساء١٩]

"তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।" (সূরা নিসা ১৯) স্ত্রীর যৌন কামনা পূরণের অধিকার হরণ না করা, গালিগালাজ, মন্দ আচরণ এবং অপমানজনক ব্যবহার দ্বারা তাকে কষ্ট না দেওয়া, তার উপর কোনো ফিতনার ভয় না থাকলে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা না দেওয়া, তার শক্তি ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে কাজের চাপ না দেওয়া এবং কথা ও আচরণে সুন্দর ব্যবহার করা ইত্যাদি সবই সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার আওতায় পড়ে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ)) [رواه الترمذي ٣٨٣٠]

"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম।" (তিরমিজী ৩৮৩০)

পর্দা

ইসলাম পরিবারকে ধ্বংস ও অবনতির হাত থেকে বাঁচানোর চরম যত্ন নিয়েছে। তাই তাকে চরিত্র ও শিষ্টাচারের শক্ত জালের দ্বারা সুরক্ষিত

করেছে। যাতে পরিবার সুষ্ঠু হয় এবং সমাজ এমন পরিষ্কার ও পরিছন্ন হয়, যেখানে প্রবৃত্তির উপদ্রব থাকবে না এবং থাকবে না স্বেচ্ছাচারিতার দৌরাত্ম্য। ফিতনা সৃষ্টিকারী সকল উত্তেজনামূলক পথকে রোধ করতে নারী-পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা নারীর সম্মানার্থে পর্দার বিধান দিয়েছন। তার মান সম্ভ্রমকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত থেকে রক্ষার্থে, কুপ্রবৃত্তি ও অসৎলোকের কুদৃষ্টি থেকে তাকে দূরে রাখতে, আর যাদের নিকট মান-মর্যাদার কোনো মূল্য নেই, তাদের কবল থেকে তাকে হেফাজত করতে, বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে জন্মায় এমন ফিতনার দরজা বন্ধ করতে এবং তার সম্ভ্রম ও নৈতিক পবিত্রতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার জালে সুরক্ষিত রাখতে পর্দার বিধান দান করেছেন।

নারীর জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলাম পর্দার বিধান অপরিহার্য করেছে। কারণ, নারীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার সৌন্দর্যও হ্রাস পায়। তাই কোনো পুরুষ যখন বাইরে যায় এবং তরুণ বয়সের যুবতীদেরকে সুন্দর সাজসজ্জায় দেখে, তখন সে ফিরে গিয়ে স্বীয় স্ত্রীর সাথে এদের তুলনা করতে শুরু করে। আর এতে বাড়িতে ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়।

একাধিক বিবাহ

মানুষের অস্তিত্বের সাথে সাথে একাধিক বিবাহের প্রথাও পাওয়া যায়। পূর্বের শরীয়ত ও প্রাচীন সমাজে এ প্রথা পাওয়া গেছে। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, চাইনা এবং হিন্দু প্রভৃতি সমাজে এ প্রথা ছিল। তখন একাধিকের কোনো সীমা ছিল না। পুরুষ তার ইচ্ছামত যতগুলো পারত বিয়ে করত। আর এতে নারী নির্যাতিত হত। এরপর ইসলাম এল এবং নারীদেরকে এই যুলুম-অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিল। একাধিক বিবাহের সীমা নির্দিষ্ট

করে দিল। আর তা হল, কেবল চারজন। অনুরূপ ইসলাম একাধিক বিবাহ করার অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে শর্তও আরোপ করল। আর তা হল, স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার করা। এতে যেন কোনো ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করল এবং কঠিন শাস্তির কথাও জানিয়ে দিল। তাছাড়া প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষ একাধিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়। যেমন, স্ত্রী যদি বাঁঝা হয়, অথবা অসুস্থ বা এই ধরনের অন্য কিছু, তাহলে এই মহিলার জন্য এটাই কি ভাল হবে যে, স্বামী তাকে তালাক্ব দিক, না তার উপর আর একজনকে বিবাহ করুক।

অনুরূপ একাধিক বিবাহ করার মধ্যে জাতিরও লাভ রয়েছে। কেননা, যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে সমাজে মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যেতে পারে। বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইউরোপে ২৫ মিলিয়ন মহিলা বিধবা হয়েছে। এখন এই মহিলাদের জন্য কি এটাই উত্তম যে তারা বিবাহ না করেই থেকে যাবে, না কারো দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সনে জারমানের মহিলারা বিক্ষোপ মিছিল বের ক'রে দাবী করেছিল যে, জারমানী মহিলাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি থেকে রক্ষা করার জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার আইন জারী করা হোক।

ইসলাম আমাদের কাছ থেকে কি চায়?

ইসলাম মুসলিমদের কাছ থেকে এটা চায় না যে, তারা দুনিয়াদারী ত্যাগ করুক এবং তা থেকে তাদের হাত শূন্য হোক। আর এটাও চায় না যে, তারা কেবল মসজিদেই বসে থাকুক বা কোনো গুহায় আশ্রয় নিয়ে সেখানে তাদের জীবন কাটিয়ে দিক। বরং ইসলাম মুসলিমদের কাছ থেকে এটাই চায় যে, তারা উত্তম সভ্যতার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হোক। মাল-ধনের দিক দিয়ে তারা সবার চেয়ে বিত্তশালী হোক। জ্ঞান

-গরিমায় সবার ঊর্ধ্বে হোক। প্রত্যেক মুসলিম খাওয়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে তার দেহের অধিকার আদায় করুক। চিত্তবিনোদন এবং আনন্দ ও তৃপ্তি গ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় নাফসের অধিকার আদায় করুক। তবে তা যেন কোনো হারাম জিনিসের দ্বারা না হয়। পরিবারের যত্ন নিয়ে ও তাদের সাথে উত্তম সদাচার ক'রে তাদের অধিকার আদায় করুক। সুন্দর তারবিয়াত, সুপথে পরিচালনা এবং দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করার মাধ্যমে সন্তানদের অধিকার আদায় করুক। প্রত্যেক সমাজের জন্য উপযুক্ত কর্ম সম্পাদন ক'রে তার অধিকার আদায় করুক। অনুরূপ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে ও আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অধিকার আদায় করুক।

ইসলাম আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, মহান আল্লাহই হলেন সারা বিশ্বের মালিক। তিনি স্বাধীন সম্রাটের মত স্বীয় সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনিই জীবন ও মরণ তাঁরই হাতে। কেউ কি পারবে নিজের মৃত্যুকে প্রতিহত করতে এবং তাকে দুনিয়াতে চিরস্থায়িত্ব দিতে? তিনিই রোগ দেন এবং তিনিই আরোগ্য দান করেন। যাকে আল্লাহ আরোগ্য দেওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন, তাকে কি কেউ আরোগ্য দিতে পারবে? কাউকে ধন-দৌলত দেন, আবার কাউকে অভাব-অনটন দ্বারা পরীক্ষা করেন। কখনো অতি বৃষ্টি দিয়ে প্লাবিত করেন, আবার কখনো অনাবৃষ্টির মাধ্যমে খরায় পরিণত করেন। প্রত্যেক বছর কোনো দেশে বন্যা হয়, আবার অন্যত্র শুকনো। এদের উপর এত পানি (বৃষ্টি) কে দেয় যে, তারা অতি বৃষ্টির অভিযোগ করে এবং যারা বৃষ্টি কামনা করে, তাদেরকে বৃষ্টি থেকে কে বঞ্চিত করেন? কে সেই সত্তা যে কাউকে কেবল কন্যা সন্তান, কাউকে কেবল পুত্র সন্তান দান করেন, আবার কাউকে বাঁঝা বানান? কোনো সন্তান দেন না। যাকে কন্যা সন্তান দান করা হয়, সেকি তা পুত্র সন্তানে পরিবর্তন করতে পারবে? আর যে বাঁঝা সেকি সন্তান জন্মাতে পারবে?

আল্লাহই কিছু মানুষের উপর তাদের শিশুকালেই মৃত্যুর ফয়সালা করেন। আবার কিছু মানুষের বয়স বৃদ্ধি করেন ফলে তারা বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কোনো দেশে ঠাণ্ডা-তুষার ঋতু প্রেরণ করেন আবার কোনো দেশে গ্রীষ্মের ঋতু প্রেরণ করেন। কোনো দেশ ভূমিকম্পের শিকার হয়। এ সব (ভূমিকম্পের দৃশ্য) তো বাস্তবে দেখা যায়। মানুষ তা ঠেকাতে পারে না এবং তা দূর করতেও পারে না। এই জন্য বহু মানুষ স্বীকার করে যে, আল্লাহই সার্বভৌমত্বের মালিক। বিশ্বের কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। তবে মু'মিন (বিশ্বাসী) হওয়ার জন্য কি এতটুকুই যথেষ্ট? না, বরং এ কথা স্বীকার করা অত্যাবশ্যক যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। যদি স্বীকার কর যে, আল্লাহ বিদ্যমান আছেন, তিনিই বিশ্বের প্রতিপালক, তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক তাহলে তাঁর সাথে অন্য কারো উপাসনা করো না। গায়রুল্লাহর জন্য ইবাদতের কোনো কিছুই নিবেদন করো না। এরই নাম ইসলাম।

'আল্লাহই বিশ্বের প্রতিপালক ও সার্বভৌমত্বের মালিক' এ কথা বিশ্বাস করা হল অন্তরের কাজ। আর বিশ্বাস মানুষকে রাখতে হয়। তবে 'তিনিই একমাত্র উপাস্য' এটা কেবল বিশ্বাস করলেই হবে না। বরং কাজে, ইবাদত পালনের মাধ্যমে এবং এই ইবাদতের অধিকারী কেবল আল্লাহকে মনে ক'রে তা সাব্যস্ত করতে হবে। কাজেই কেউ যদি তাঁর ইবাদত করা থেকে বিরত থাকে অথবা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে সে মু'মিন গণ্য হবে না, যদিও সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই বিশ্বের প্রতিপালক ও সার্বভৌমত্বের মালিক।

যে অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে যে, ইষ্টানিষ্ট সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে আসে, হালাল ও হারাম করার অধিকার কেবল আল্লাহর, তাঁকেই ভাল

বাসতে হয়, ভয়ও তাঁকেই করতে হয় এবং আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য, সে অন্তর আল্লাহর মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ হয়। 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহই মহান) এ কথার অর্থ সে অন্তর উপলব্ধি করে। ফলে আল্লাহর মোকা-বেলায় অন্য সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। দুআ করা, নামায পড়া, রুকু ও সাজদা, মানত ও জবাই করা এবং তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ ইত্যাদি কাজগুলি যেহেতু মানুষের সেই কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা কারো সম্মান প্রদর্শন ক'রে করা হয়, তাই মু'মিন তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করতে পারে না। অন্য কারো জন্য নামায পড়তে পারে না। রুকু ও সাজদা কেবল তাঁকেই করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বলতে পারে না 'সুবহা-নাকা' (আমি তোমার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি)। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে না। কারণ, এ সব কাজই হচ্ছে সম্মান প্রদর্শনের কাজ। আর এটাই হচ্ছে ইবাদতের মূল রহস্য।

ইসলাম পূর্বের পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়

এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামকে বানিয়েছেন পূর্বের সমস্ত পাপ ও অন্যায় কাজের ধ্বংসকারী। তাই যখন কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কৃত সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেন এবং সে পাপাচার থেকে একেবারে স্বচ্ছ-নির্মল হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ ইসলাম গ্রহণের তাওফীক্ব দিয়ে অনুগ্রহ করেন, তার পূর্বের হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ-বিত্তকেও তার জন্য হালাল করে দেন। সে মাল-ধন নিজের কাছে অবশিষ্ট রাখাতে, তা থেকে সাদক্বা করাতে এবং তা দিয়ে বিবাহ-শাদী করাতে তার কোনো গুনাহ হয় না। কারণ, মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থে বলেছেন,

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨]

"অবিশ্বাসীদেরকে তুমি বল, 'যদি তারা (কুফরী ও অবিশ্বাস থেকে) বিরত হয়, তাহলে অতীতে তাদের যা (পাপ) হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন।" অর্থাৎ, পূর্বে যা কিছু হয়ে গেছে, তা সবই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তবে যে মাল কারো কাছ থেকে আত্মসাৎ করবে, সে মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দিতেই হবে। হ্যাঁ, যে মাল সে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মানুষের সাথে কারবারের মাধ্যমে সন্তুষ্ট পন্থায় উপার্জন করেছে, তা যদি সূদ অথবা মাদকদ্রব্য ইত্যাদি হারাম উপায়েও উপার্জিত হয়, তবুও তা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে।

মুসলিম বান্দার পাপ যত বেশী হোক না কেন তার জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্তই থাকে। আর তাওবার প্রয়োজন মানুষের সব সময়ই। কারণ, প্রত্যেক আদম-সন্তান দ্বারা ভুল-ক্রটি হয়েই যায়। তবে সর্বোত্তম ক্রটিকারী সে-ই, যে ক্রটি করেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এ কথা বলেছেন বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-মানুষ যেহেতু নিষ্পাপ হতে পারে না, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য তাওবার দরজা খুলে দিয়ে তাদেরকে তার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزُّمر:٥٣]

"ঘোষণা করে দাও, হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, আল্লাহর করুণা হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার ৫৩)

কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করবেন?

ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগতির পর, আর এ কথা জানার পর যে, আল্লাহর নিকট মুক্তির পথ কেবল ইসলাম, ইসলাম গ্রহণ করা প্রত্যেকের উপর অপরিহার্য, ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্য কোনো পথ নেই। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর হল, যখন আপনি ইসলামে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবেন, তখন আপনার করণীয় হবে, মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিবেন যে, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ-ﷺ-হলেন তাঁর প্রেরিত রাসূল।' অতঃপর ইসলামের অন্য বিষয়াদির শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তা বাস্তবায়িত করবেন। যেমন, নামায পড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ইসলামী সংস্থায় এমন গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, যার দ্বারা ইসলামের বিধি-বিধানকে আরো ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	ভূমিকা
৪	আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
৫	ইসলামের পরিচয়
৬	সৃষ্টির সূচনা
৮	নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-
৯	তাঁর বংশ পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী
১৫	নবী করীম-ﷺ-এর চরিত্র
২০	ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়াদি
২৫	ইসলামে ইবাদত
২৬	ইসলামের রূকনসমূহ
২৮	ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য
৩৯	ইসলামের সুন্দর কিছু দিক
৪৩	শেষ দিবস
৬০	ইসলামে নারীর মান
৬৪	নারীর সাধারণ কিছু অধিকার
৬৭	পর্দা
৬৮	একাধিক বিবাহ
৬৯	ইসলাম আমাদের কাছ থেকে কি চায়?
৭২	ইসলাম পূর্বের পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়
৭৪	কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করবেন?